

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি: গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

(বাংলা-bengali-البنغالية)

আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

সম্পাদক : মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

1430ھ - 2009م

islamhouse.com

﴿ النظرة الإيجابية وأهميتها في حياة الإنسان ﴾

(باللغة البنغالية)

عبد الله شهيد عبد الرحمن

مراجعة

محمد شمس الحق صديق

2009 - 1430

islamhouse.com

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি: গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

যদি এমন একটি গ্লাস থাকে যার অর্ধেকটা পানি দিয়ে ভর্তি আর অর্ধেকটা শূন্য তাহলে এটাকে দুভাবে মূল্যায়ন করা যাবে।

এক. ইতিবাচক মূল্যায়ন। অর্থাৎ বলা হবে যে গ্লাসটি অর্ধেকটা পূর্ণ। গ্লাসটি খালী নয়। আর এ অর্ধগ্লাস পানি মানুষের জন্য উপকারী।
দুই. নেতিবাচক মূল্যায়ন। যেমন বলা হবে গ্লাসটির অর্ধেকই খালী। অপূর্ণাঙ্গ। আর এ অর্ধগ্লাস পানি দিয়ে কি-ই বা হবে।

প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি কর্ম মূল্যায়নকালে এভাবে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আপন করে নেয়া যায়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমার আলোচনার বিষয় হল, ইসলাম আমাদেরকে কোন ধরনের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আপন করতে উৎসাহ দেয়। ইতিবাচক মূল্যায়ন না নেতিবাচক মূল্যায়ন?

ইতিবাচক মূল্যায়ন মানুষকে উৎসাহ যোগায়, উদ্দীপনা দেয়, সামনে এগুতে সাহস যোগায়, যা মানুষকে উপকার করে তা অর্জন করতে শেখায়, ধৈর্যধারণে উৎসাহ দেয়, মানুষের মধ্যে সৃজনশীলতা ও আবিষ্কারের মানসিকতা সৃষ্টি করে, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, অন্যকে ভালবাসতে উদ্বুদ্ধ করে। নেতিবাচক মূল্যায়ন মানুষকে নিরুৎসাহিত করে, হতাশ করে, অলস হতে সাহায্য করে, ধৈর্যহীন করে তোলে, নৈরাশ্যবাদের জন্ম দেয়, অন্যের প্রতি হিংসা, পরনিন্দা ও অবমাননা ইত্যাদিতে উৎসাহিত করে। ইসলাম তার অনুসারীদের কাছ থেকে সর্বক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কামনা করে। এর উদাহরণ হিসেবে আল-কুরআন ও হাদিসের অসংখ্য দৃষ্টান্ত থেকে মাত্র কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরছি।

প্রথমত: আল কুরআন থেকে

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে বলেন
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا

"আর আমি আকাশ ও পৃথিবী ও এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা অনর্থক সৃষ্টি করিনি।" [সূরা সাদ: ২৭]

আল্লাহ তাআলার এ বাণীতে আমরা দেখলাম যে তিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে তার বান্দাদেরকে দিয়েছেন ইতিবাচক ধারণা; তার সৃষ্টির কোন

কিছুই অনর্থক নয়, প্রতিটি বস্তু মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি। আমরা পৃথিবীর অনেক কিছু দেখেই মন্তব্য করে থাকি যে, কেন যে আল্লাহ এ বিষয়টি সৃষ্টি করলেন? আমরা আসলে এ জাতীয় প্রশ্ন করি সৃষ্টিবস্তুতে স্থিত ইতিবাচক দিকগুলো বুঝে না আসার কারণে। আল-কুরআনের দাবি অনুযায়ী এ রকম মন্তব্য করা বা ধারণা করা অশুদ্ধ। আল্লাহ তাআলা। ঐ ঈমানদারদের প্রশংসা করেছেন, যারা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তাআলা তার সৃষ্টির কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। আল্লাহ তাআলা বলেন:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا . سورة آل عمران: 191

"যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে এবং আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে, বলে, হে আমাদের রব আপনি এসব অনর্থক সৃষ্টি করেননি।"[সূরা আলইমরান:১৯১]

এ আয়াতে আমরা দেখলাম আল্লাহ তার ঐ সকল বান্দাদের প্রশংসা করেছেন যারা সকল সৃষ্টি সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। তিনি আরো বলেন:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا . سورة البقرة: 29

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সকল কিছু তোমাদের কল্যাণের জন্য।"[সূরা আল বাকার:২৯]

আল্লাহ তাআলার এ রকম বাণী রয়েছে আল-কুরআনের বহু স্থানে। এ সকল আয়াত দিয়ে তিনি পৃথিবীর সকল সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে এত পছন্দ করেন যে, একটি নেতিবাচক বিষয়কে শুধু বাদ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন না, তিনি বরং সেটিকে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে ইতিবাচকে পরিণত করে দেন।

ইরশাদ হয়েছে :

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا . سورة الفرقان : 70

"তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। পরিণামে আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[সূরা আল ফুরকান: ৭০]

দেখুন এ আয়াতে, যারা অসৎ ও কুকর্ম থেকে তাওবা করে ঈমান আনবে তাদের ক্ষমা করে দেয়াটা একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি ঈমান ও তাওবার কারণে পাপগুলোকে শুধু ক্ষমাই করে দেন না, বরং তা পূণ্যে রূপান্তরিত করে দেন। পাপগুলোকে তার জন্য উপকারী বস্তুতে পরিণত করে দেন। অনেক স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে সমস্যায় পড়েন। স্ত্রীর কোন কিছুই পছন্দ হয় না। সামান্য পান থেকে চুন খসলে অনেকে তাদের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বসেন। তারা মনে করেন, যখন তাকে ভাল লাগে না তখন তার সাথে বসবাস করে সুখের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব হবে না। এটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। আল্লাহ তাআলা এ প্রকৃতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বারণ হতে বলেছেন।

ইরশাদ হয়েছে:

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا . سورة النساء: 19

"আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোন কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন।" [সূরা আন-নিসা:১৯]

সূরা আন - নূরে বর্ণিত বিষয়টির প্রতি খেয়াল করুন। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা. এর অপবাদে ঘটনা ঘটল। মুসলিম সমাজ এ নিয়ে বড় বিপদে পড়ে গেল। এমনকী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত চিন্তিত, ব্যথিত হলেন। এমন একটি অপবাদের ঘটনা না ঘটাই কাম্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ বিপজ্জনক এ ঘটনাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখার নির্দেশ দিলেন।

তিনি বললেন :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

"নিশ্চয় যারা এ অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর মনে করো না, বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।"

এ রকম শত শত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের শিক্ষা রয়েছে আল কুরআনের বহু আয়াতে।

দ্বিতীয়ত: হাদিসে রাসূল থেকে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا

"মানুষ মূল্যবান ধাতুর ন্যায়, স্বর্ণ-রৌপ্যের মতো। জাহেলী যুগের ভাল মানুষেরা ইসলামী যুগেও ভাল মানুষ। যদি তারা বুঝে।" [মুসলিম]

দেখুন এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে মানুষের ব্যাপারে ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন। মানুষকে তিনি স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায় মূল্যবান থাতু বলে উল্লেখ করেছেন।

কখনো কখনো মানুষের জীবনে বিপদ আসে। অধিকাংশ মানুষ বিপদকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে। আবার যখন সুখের দিন আসে মানুষ সেটাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন, সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থাই মানুষের জন্য ইতিবাচক। প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে।

হাদিসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ঈমানদারের বিষয়টি আশ্চর্যজনক। তার সকল কাজই কল্যাণকর। ঈমানদার ছাড়া অন্য কোন মানুষের এ সৌভাগ্য নেই। তার যদি আনন্দ বা সুখকর কোন বিষয় অর্জিত হয়, তাহলে সে আল্লাহর শোকর করে, ফলে তার কল্যাণ হয়। আর যদি তাকে কোন বিপদ-মুসীবত স্পর্শ করে, তাহলে সে ধৈর্য ধরে, এতেও তার কল্যাণ হয়।" [মুসলিম]

তিনি আরো বলেছেন

لا تحقرن من المعروف شيئا

"যা কিছু ভাল, তা যত ছোটই হোক, তুমি কখনো তা অবমূল্যায়ন করো না।" দেখুন কিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব বিষয়কে নিজের জন্য ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করার জন্য ঈমানদারদের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। আরো একটি চমৎকার উদাহরণ দেখুন:

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين . رواه أبو داود والنسائي.

সাহাবি আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, দু ব্যক্তি সফরে গেল। নামাজের সময় যখন উপস্থিত হল, তখন তাদের কাছে অজু করার মত পানি ছিল না। উভয়ে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করল। এরপর পানি পেল। তখন একজন অজু করে নামাজ পুনরায় আদায় করল। অন্যজন পুনরায় নামাজ আদায় করা থেকে বিরত থাকল। এরপর উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে ঘটনার বিবরণ দিল। যে নামাজ পুনরায় আদায় করল না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, "তুমি সুনাত মত কাজ করেছ। তোমার নামাজ আদায় হয়েছে।" আর যে পুনরায় নামাজ আদায় করেছে তাকে তিনি বললেন, "তোমার জন্য আছে দ্বিগুণ পুরস্কার।"

দেখুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়ের ব্যাপারে কিভাবে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত দিলেন। অথচ উভয়ে ছিল পরস্পর-বিরোধী অবস্থানে। আমরা এ অবস্থা দেখে কোনটা সঠিক মন্তব্য করতে না পারলেও বলতাম, অবশ্যই একটি সঠিক হবে, আর অন্যটি হবে ভ্রান্ত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়টিকেই স্বীকৃতি দিলেন। আর সঠিক কোনটি তার প্রতি ইঙ্গিতও করলেন। দাওয়াত-কর্মী ও আলেমদের, এ বিষয়টি রাসূলের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা খুবই জরুরি।

বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত একশ মানুষ খুন করার তাওবা সম্পর্কিত একটি প্রসিদ্ধ হাদিসে দেখা যায় যে, খুনীব্যক্তি নিরানব্বই জনকে খুন করার পর একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমার তাওবা করার সুযোগ আছে কি না।' উত্তরে সে বলেছিল, 'তাওবার সুযোগ নেই।' অতঃপর তাকেও সে খুন করল। পরে একজন আলেমকে খুনীব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'তাওবা করার সুযোগ আছে কি না।' সে বলল, 'হ্যাঁ, তাওবার সুযোগ আছে।' দেখা গেল প্রথম জনের উত্তর ছিল নেতিবাচক, আর দ্বিতীয়জনের উত্তর ছিল ইতিবাচক। দ্বিতীয় ব্যক্তির উত্তরটি আল্লাহর কাছে সঠিক ছিল।

ইজতেহাদ বা গবেষণানির্ভর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৃষ্টিভঙ্গি দেখুন। তিনি বলেছেন, গবেষক যদি গবেষণায় ভুল সিদ্ধান্ত দেন তাহলে তার জন্য পুরস্কার একটি। আর যদি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান তা হলে তার পুরস্কার দুটি। ইজতিহাদ বা গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি কত বড় ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন। প্রথমত তিনি গবেষণাকে উৎসাহিত করেছেন, দ্বিতীয়ত সঠিক ও নির্ভুল গবেষণা করতে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি যদি বলতেন, 'সাবধান, গবেষণা একটি কঠিন কাজ। তোমরা যারা ইজতিহাদ করবে তারা যদি ভুল করো তাহলে কঠোর আযাব দেয়া হবে।' তাহলে আমরা বলতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই বলেছেন। আর এভাবে বললে, কোন কিছু নিয়ে মানুষ গবেষণা করতে উৎসাহ পেত না। কিন্তু তিনি ছিলেন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। এ জাতীয় উদাহরণ হাদিসে রাসূলে বহুল পরিমাণে পাওয়া যাবে।

নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে ইতিবাচকে পরিণত করার দৃষ্টান্ত

উহুদের যুদ্ধে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। এ কারণে মদীনাবাসীর হৃদয়ে উহুদ পাহাড় সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। উহুদ পাহাড়ের দিকে তাকালে যুদ্ধে তাদের দুর্বস্থার কথা মনে পড়ে যেত। মনে পড়ে যেত যুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া আপনজনদের কথা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাবাসীদের এ নেতিবাচক ধারণা পাল্টে দিলেন। তিনি বললেন: "উহুদ আমাদের ভালবাসে আমারও উহুদকে ভালবাসি।"

মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তার কোনো আপনজন মৃত্যু বরণ করে তখন তা তার জন্য এক বিশাল বিপদ হয়ে দেখা দেয়। এ অবস্থায় মানুষ যাতে নৈরাশ্যে আক্রান্ত না হয়, বরং আশায় বুক বাঁধে, এ অবস্থাতেও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে যায় তার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। "যখন কারো বিপদ আসে তখন সে বলবে

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجْرْنِي فِي مَصِيبَتِي هَذَا وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

অর্থাৎ (আমরা আল্লাহর জন্য এবং তার কাছেই ফিরে যাব। হে আল্লাহ! এ বিপদে আমাকে আপনি পুরস্কার দান করুন। আর এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম বস্তু

আমাকে দিন।) তাহলে তার চলে যাওয়া বিষয় হতে উত্তম নেয়ামত আল্লাহ তাআলা তাকে দান করবেন।"

দেখুন, কিভাবে তিনি একটি নেতিবাচক অবস্থানকে সম্পূর্ণ ইতিবাচকে পরিণত করার ব্যবস্থা দিলেন।

আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখুন, সহিহ হাদিসে এসেছে:

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع قبيحا غيره، فمر على قرية يقال لها عفرة فسمها خضرة.

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খারাপ কোন নাম শুনতেন তখন তা পরিবর্তন করে দিতেন। তিনি এক গ্রামের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন যার নাম ছিল 'আফরাহ' (ধুলায় ধুসরিত) তিনি গ্রামের নামটি পরিবর্তন করে নতুন নাম দিলেন 'খাদরাহ' (সবুজ-শ্যামল)। [তাবরানি:৩৭১/১]

আমরা দেখি যখন কোন নদীতে লঞ্চ ডুবে যায় বা ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় তখন অনেকে নদীকে গালি দেয়, বলে রাস্কুসে নদী! ঝড়কে গালি দেয়, বলে সর্বনাশী সিডর ইত্যাদি। এটা একটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। এটা পরিবর্তন করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা বাতাস-কে গালি দেবে না।" "তোমরা যুগ বা সময়-কে গালি দেবে না।" "তোমরা মোরগ-মুরগীকে গালি দেবে না।" "কোন বস্তু বা বিষয়-কে তোমরা কুলক্ষণ মনে করবে না। সবকিছুকে সুলক্ষণ মনে করা আমার কাছে প্রিয়।" এভাবে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে ইতিবাচকে পরিণত করে দেয়ার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে হাদিস ও সীরাতে রাসূলে।

ইতিবাচক মূল্যায়নের উপকারিতা

অনেকেই আছেন যারা কারো কোনো কাজ বা কীর্তি দেখলে কর্তাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে মূল্যায়ন না করে তা নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্লেষণ করেন। তারা ভাল কাজের স্বীকৃতি দিতে নিরাগ্রহ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো মধ্যে সামান্য ভাল কাজ দেখলে তা ইতিবাচক দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করার সাথে সাথে তার প্রশংসা করতেন। তাকে বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করতেন। দেখুন তিনি তার সাহাবীদের সম্পর্কে বলছেন:

أفضل أمتي أبو بكر، وأشهدهم في الله عمر، وأكثرهم حياء عثمان، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأقربهم إليّ زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلل والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أميناً، وأمين هذه الأمة: أبو عبيدة عامر بن الجراح.

"আমার উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আবু বকর, আল্লাহর ব্যাপারে সবার চেয়ে কঠিন উমার, সর্বাপেক্ষা লজ্জাশীল উসমান, কুরআন সর্বাপেক্ষা ভাল তেলাওয়াতকারী উবাই বিন কা'আব, আমার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি যায়েদ বিন সাবিত এবং হালাল হারামের ব্যাপারে সর্বাধিক বিজ্ঞ মুআজ বিন জাবাল। সাবধান ! প্রত্যেক জাতির একজন সমধিক বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে, আর আমার উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি হচ্ছে-আবু উবাইদাহ আমার ইবনুল-যাররাহ।" [আমদ ও তিরমিযি]

দেখুন তিনি এ হাদিসে তার সাহাবীদের কিভাবে ইতিবাচক মূল্যায়ন করেছেন। তাদের প্রশংসা করেছেন। সম্মানজনক উপাধি দিয়েছেন। তিনি সাহাবী আসজ ইবনে আবদে কায়েসকে বলেছিলেন:

إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والإناة. (رواه مسلم)

"তোমার মধ্যে দু'টো গুণ রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন ; ধৈর্য ও ধীরস্থিরতা।" [মুসলিম]

কেন ইতিবাচক মূল্যায়ন জরুরি?

ইতিবাচক দিকের আলোচনা মানুষের মধ্যে সৎকাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে। ব্যক্তিসত্তা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করে। তাকে এ বিশ্বাস করতে শেখায় যে, সে এ সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যাকে যে গুণের কারণে মূল্যায়ন করা হবে সে তার সেই গুণটির গুরুত্ব দেবে। সে বিশ্বাস করবে, আমাকে যখন এর জন্য প্রশংসা করা হয়েছে তখন এটি আমার সম্পদ। এ সম্পদ আমাকে রক্ষা করতে হবে। এর উপর অবিচল থাকতে হবে। সাথে সাথে সে এর অতিরিক্ত ভাল গুণটি অর্জন করার জন্য আগ্রহ দেখাবে। দেখুন আবু বকর রা. সম্পর্কে রাসূল বললেন, 'সে আমার উম্মতের মধ্যে দয়াদ্র।' আর উমার রা. সম্পর্কে বললেন সে 'আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে কঠোর।' ফলে উভয়ে চেষ্টা করলেন অন্যের গুণটিকে নিজে আয়ত্ত করতে। তাই আমরা দেখি ধর্মদ্রোহীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের বেলায় আবু বকর রা. কঠোর হয়েছিলেন আর উমার রা. হয়েছিলেন দয়াদ্র।

আবার কারো ইতিবাচক গুণের প্রকাশ্যে মূল্যায়ন করলে বা স্বীকৃতি দিলে যার মধ্যে এ গুণটির অভাব আছে সে এটি অর্জনের জন্য আগ্রহী হয়ে থাকে। যখন মানুষের মধ্যে সকলের ভাল গুণগুলোর ইতিবাচক মূল্যায়নের সংস্কৃতি চালু হয়ে যাবে তখন পরনিন্দা, গীবত, পরদোষ-চর্চা, অপবাদ, গালিগালাজ ইত্যাদি খারাপ আচরণগুলো দূর হয়ে যাবে।

এমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীদের কাউকে উপাধি দিয়েছেন, সাইফুল্লাহ, কাউকে আসাদুল্লাহ, কাউকে তাইয়ার আবার কাউকে আমীনুল উম্মাহ বলে। এগুলো সবই ছিল ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ও ইতিবাচক দৃষ্টিতে মূল্যায়ন।

আলেম-উলামা দাওয়াত-কর্মীদের জন্য এ গুণটির প্রয়োজনীয়তা আমাদের আলেম-উলামা, দাওয়াতী কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এ গুণটি থাকা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হল, তাদের মধ্যেই এ গুণটির অভাব সবচেয়ে বেশী। তিনটি উদাহরণ দিচ্ছি:

এক. আমি একটি মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করলাম। দেখলাম খতীব সাহেব খুতবাহপূর্ব বক্তৃতার এক পর্যায়ে বললেন, আজকাল অনেক মৌলভীকে দেখা যায় টেলিভিশনে আলোচনা করতে। এরা সব কমার্শিয়াল মৌলভী। এরা পলিটিক্সবাজ।

এখানে তিনি যে সকল আলেম টিভিতে আলোচনা করেন তাদেরকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছেন। এবং তার দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্য মুসল্লীদের শেয়ার করার চেষ্টা করেছেন।

দুই. এক মসজিদে জুমার নামাজ পড়ছিলাম। মুহতারাম খতীব প্রথম খুতবা দিলেন বাংলা ভাষায়। পরের খুতবা দিলেন আরবিতে। খুতবার মধ্যে বললেন, যারা শুধু আরবি ভাষায় খুতবা দেয় তাদের খুতবা সঠিক নয়। মানুষে কিছু বোঝে না। সৌদি আরবের সকল আলেম একমত যে, খুতবা দিতে হবে স্থানীয় ভাষায়। তারা মানুষকে বোঝাতে যেয়ে খুতবার পূর্বে বাংলাতে আলোচনা করেন। এটা বেদআত।"

আবার অন্য এক মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করলাম। খতীব আরবিতে খুতবা দিলেন। খুতবাপূর্ব বক্তৃতায় বললেন, দু একজন পণ্ডিত আছেন যারা বাংলাভাষায় খুতবা দেন। বাংলা ভাষায় খুতবা দেয়া বেদআত। বাংলায় খুতবা দিলে খুতবা আদায় হয় না।"

এ ধরনের ঘটনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধরনের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন আমরা যদি সেরূপ করতে সক্ষম হতাম, তা হলে বহু সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত। অর্থাৎ যদি এরূপ ভাবে সক্ষম হতাম যে, যে ব্যক্তি আরবিতে খুত্বা দেওয়া জরুরি মনে করছে সেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের পায়রবি করছে, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবি ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় খুত্বা দেননি। আর যে ব্যক্তি মাতৃভাষায় খুত্বা দেওয়ার প্রতি জোর দিচ্ছে সেও রাসূলুল্লাহর সুন্নাতের বিরুদ্ধে যায় নি, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় খুত্বা দিতেন না।

তিন. হকপন্থি জনৈক আলেমের আত্মীয় তাবলিগ জামাআতের সাথে সময় লাগাতে বের হয়েছেন, তিনি সময় লাগাতে গেলেন জয়পুর হাটে। যে মসজিদে জামাতটি অবস্থান নিল তার ইমাম ছিলেন আহলে হাদিসের জনৈক আলেম। আত্মীয় লোকটি মোবাইলে উল্লিখিত আলেম-আত্মীয়ের কাছে একটি মাসআলা জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, যে মসজিদে আমরা নামাজ পড়ি তার ইমাম সাহেব আহলে হাদিসের লোক। তাই আমীর সাহেব বলেছেন, তাদের পিছনে নামাজ হবে না। তাদের পিছনে নামাজ পড়লে নামাজ ঘুরিয়ে পড়তে হবে।" প্রশ্ন হল, আমীর সাহেবের কথা কি ঠিক? আমাদের নামাজ কি দ্বিতীয়বার ঘুরিয়ে পড়তে হবে?

উত্তরে বলা হল, না, দ্বিতীয়বার পড়তে হবে না। আহলে হাদিসের ইমামের পিছনে নামাজ পড়লে তা অবশ্যই শুদ্ধ হবে। সে বেচারী এ কথা আমীর সাহেবকেও বললেন। আমীর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কে বলেছে এ মাসআলা? তিনি বললেন, আমার অমুক আত্মীয়। সে আলেম। একটি গবেষণা সংস্থায় কাজ করে।" আমীর সাহেব বললেন, তাদের পিছনেও নামাজ হয় না। তারাও এ দলের লোক।"

প্রিয় পাঠক! দেখুন, এত বড় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কীভাবে দাওয়াত কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব? যারা দাওয়াত, তাবলিগ ও তালিমের কাজ করেন তাদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন? তিনি বলেছেন:

"তোমরা সহজ করো কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও। ঘৃণা সৃষ্টি করো না।"[আহমদ ও বায়হাকি]

আমাদের ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার এত বেশী যে, নতুন কোন কিছু দেখলে তা কিভাবে হারাম ঘোষণা করা যায় সে প্রচেষ্টা শুরু করে দেন। এটাকে ইতিবাচক হিসাবে নিয়ে তা কীভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়, শুরুতে তারা সে কথা ভাবতেই পারেন না। আর যখন ভাবতে শুরু করেন, তখন সময় তাদেরকে পিছনে রেখে এগিয়ে যায় দূর বহু দূর। শুধু তাই নয়, বরং দেরি করে হলেও যখন কেউ চিন্তা শুরু করে সচেতনতার পরিচয় দেন, তখন আলেমদের অন্য একদল তাদের ব্যাপারে জনগণের মধ্যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করতে থাকেন। তাদের ইতিবাচক চিন্তা ও কর্মও হয় বাধাগ্রস্ত।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরতের পর খেজুর গাছে পরাগায়ন করাকে অপয়োজনীয় বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে যখন ফলন কম হল তখন তিনি আবার তা করার অনুমতি দিলেন। কারণ মতামতটি ছিল তার ব্যক্তিগত। তাই আলেম উলামা, ইসলামের দাওয়াত-কর্মী সকলকে বিষয়টি অনুধাবন করা উচিত। মানুষকে কাছে টানতে হলে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে ইসলামের আলোকে ইসলামের স্বার্থে। তবে তা করতে হবে কুরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে। কুরআন ও হাদিস যা স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছে সেখানে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের নামে তা হালকা করে দেয়ার কোন সুযোগ নেই। কুরআন ও হাদিস বাদ দিয়ে অন্য কারো মতবাদ, তরিকা অবলম্বন করা হল ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির একটা বড় অন্তরায়।

নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি হল মুনাফেকদের স্বভাব যারা মুনাফেক তারা সকল কিছু নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে থাকে। আল কুরআনে এর বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, "তারা সকল আওয়াযকে নিজেদের বিরুদ্ধে বলে ভাবে।"

এমনকি আমরা অনেক সময় বলে থাকি মুসলমানগণ খারাপ হয়ে গেছে, তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে। কথাটি সঠিক হলেও মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে

ইতিবাচক ধারণা রাখতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

الخير فيَّ وفي أمتي إلى يوم القيامة

"আমি এবং আমার উম্মতের মধ্যে কেয়ামত অবধি কল্যাণ বিদ্যমান থাকবে।"

সমাপ্ত